সুশীল রুচির শিল্পিত মোড়কে আবৃত ঋতুপর্ণ ঘোষের চলচ্চিত্র 'চোখের বালি'তে রুচি ও যৌনতার প্রশ্ন•

মনিরা শরমিন প্রীতু

১. ঋতুপর্ণ ও তাঁর 'চোখের বালি' : প্রারম্ভিক পরিচিতি

ঋতুপর্ণ, বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্রের এক মহারথী নির্মাতা। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখের পর বাংলার যেসব নির্মাতার নাম গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়, ঋতুপর্ণ তাঁদের অন্যতম। ১৯৯২ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় যিনি নির্মাণ করেছেন মোট ১৮টি চলচ্চিত্র (*পরিশিষ্ট* ১)। পেয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অজস্র পুরস্কার (*পরিশিষ্ট* ২)। উপরন্তু, মুম্বাইকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র বাজারেও রয়েছে তাঁর শক্ত অবস্থান।

বিশ্বায়নের এই যুগে তাই বাংলাদেশেও এই খ্যাতিমান ঋতুপর্ণ প্রবল দৌরাত্ম্যেই প্রবেশ করেন; এবং তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে তাঁর চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনায় মাতেন এদেশের 'বোদ্ধা'শ্রেণি। ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে রুচিশীল দর্শকের চলচ্চিত্র। এলিট মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের বাংলা চলচ্চিত্রের সংগ্রহে তাই ঋতুপর্ণ হয়ে ওঠেন অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ঢাকাই বা এফডিসির চলচ্চিত্র দেখে নাক সিটকানো যাদের চিরায়ত স্বভাবে পরিণত হয়েছে, তারাই ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্রের মূল দর্শক। তাঁর চলচ্চিত্র না-দেখে বর্তমানে এদেশে-ওদেশে 'বিকল্প চলচ্চিত্র', 'আর্টফিল্ম' তৈরি বা লেখালেখি করার মতো 'ভারী রুচি'র কাজটা যেন অপূর্ণই থেকে যায়।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা ঋতুপর্ণের বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করে যান মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রথম সারির সব আইকন। একে একে ঋতুপর্ণ তাঁর চলচ্চিত্রে কাজ করিয়ে নেন জ্যাকি শ্রফ, সোহা আলী খান, মিঠুন চক্রবর্তী, রাইমা সেন, কঙ্কনা সেনগুপ্তা, রাখী, শর্মিলা ঠাকুর, অভিষেক বচ্চন, কিরণ খের, বিপাশা বসু, অজয় দেবগন এবং ঐশ্বর্য রাইয়ের মতো রথী-মহারথীদের দিয়ে। মুম্বাইয়ের প্রবল বাজারকেন্দ্রিক অভিনয়শিল্পীদের দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে টানা অভিনয় করিয়ে নেয়ার মতো ঘটনা এই পর্যন্ত কেবল ঋতুপর্ণই ঘটিয়েছেন। সুতরাং কী ফিচার, কী ব্যবসায়িক, কী বিকল্প, সব ধরনের চলচ্চিত্রেই ঋতুপর্ণ ঘোষ যে অতি পারঙ্গম ব্যক্তিত্ব, তা চলতি বাজারের পাশাপাশি বাম-ডানঘেঁষা চলচ্চিত্রবোদ্ধারাও কখনো স্তুতি কখনো নীরবতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রবলভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্রের টেক্সট নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলেছেন বলে আমার জানা নেই।

যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের এই বরেণ্য নির্মাতা ২০০৩ সালে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে নির্মাণ করলেন 'চোখের বালি' চলচ্চিত্রটি। চলচ্চিত্রের ক্যাটাগরি অনুযায়ী 'চোখের বালি'ও ফিচারফিল্মের মধ্যেই পড়ে। এই চলচ্চিত্রটির জন্য তিনি ২০০৪ সালে সেরা বাংলা

• লেখাটি মামুনুর রশীদ মামুনকে উৎসর্গ করা হলো... প্রেমে, অপ্রেমে, ভালোবাসায়, ঘৃণায়, অহিংসায়, হিংসায়, সত্যে, মিথ্যায়, হাসিতে, কান্নায়, স্থিরতায়, অস্থিরতায়, দ্রোহে, পলায়নে— যে বিনাপ্রশ্নে-বিনাদ্বিধায় আমার আশ্রয় হয়েছে...

ফিচারফিল্ম ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া চলচ্চিত্রটি ২০০৩ সালে লোকার্নো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য মনোনীত হয়ে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার পায়।

আগেই বলেছি, ঋতুপর্ণ খোদ বাংলা চলচ্চিত্রের একটি মহান ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত হন, সেখানে তিনি আবার তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য বেছে নিলেন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'চোখের বালি'; ১০০ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কখনোই যে রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি, এত আলোচনা-সমালোচনাও যাঁকে ক্লিশে করতে পারে নি। মানবীয় সংস্কৃতির যে পরিসর, তার বাইরের বাজারি সাংস্কৃতিক পরিসরেও রবীন্দ্রনাথের অপার আনাগোনা। বাঙালি মধ্যবিত্তের বিশাল জায়গাজুড়ে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এলিট মধ্যবিত্তের মার্জিত রুচির সাংস্কৃতিক বাজার ধরতে তাই রবীন্দ্রনাথ নামটাই অন্যতম উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়।

অন্যদিকে, প্রায় দুই দশকজুড়ে করপোরেট পুঁজিকেন্দ্রিক মুম্বাই-চলচ্চিত্রের প্রথম সারির এক নম্বর আইকন ঐশ্বর্য রাই ঋতুপর্ণের সাথে কাজ করেছেন এই চলচ্চিত্রটিতে। এই ঐশ্বর্য রাই শুধু মুম্বাই-চলচ্চিত্রেরই নন, বরং বিশ্বায়িত বাজারের নামি-দামি সব পণ্যের 'সুন্দরী' ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডরও বটেন।

সুতরাং যেকোনো চলচ্চিত্রেই ঐশ্বর্য শুধু ব্যক্তি-অভিনেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হবেন, এত সরল হিসেবে আমি যেতে পারি না। তিনি একাধারে 'বিশ্বসুন্দরী', লাক্স, সানসিল্কসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পণ্যের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর, কান চলচ্চিত্রের জুরি। সর্বোপরি, বিশ্ববিখ্যাত সব 'পণ্যের বহিরঙ্গের পণ্য' (ফাহমিদুল হক, ২০১০) হিসেবে বিকোনো সেই নারী, যিনি তাঁর শরীরকেন্দ্রিক আবেদনকে পুঁজি করে মুম্বাইয়ের অধিপতি ধারার ঝাকানাকা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পাশাপাশি ফিচারফিল্ম বানানেওলা ঋতুপর্ণদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেন, উপহার দেন ব্যবসা-সফল চলচ্চিত্র। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গের বাংলা চলচ্চিত্রে এটাই তাঁর প্রথম কাজ। সুতরাং স্পষ্টতই ঐশ্বর্যের উপস্থিতি চলচ্চিত্রটিকে বাড়তি মাত্রা প্রদান করে।

আর তাই, এত উপাদানের সম্মিলনে নির্মিত ব্যবসাসফল এই চলচ্চিত্রটির ভারতের মতো এদেশের এলিট দর্শকের মনোযোগ কাড়তেও এতটুকু সমস্যা হয় নি; যার প্রমাণ আমাদের পত্রপত্রিকা, যেগুলো মুহূর্তেই সরব হয়ে ওঠে এই ভিনদেশি চলচ্চিত্রটি নিয়ে। চলচ্চিত্রসংক্রান্ত এদেশি পত্রিকাগুলোতেও তখন আলাদা 'ট্রিটমেন্ট' পেতে থাকে 'চোখের বালি'। এ সংক্রান্ত স্তুতিমূলক আলোচনার জোয়ারে মেতে ওঠেন বোদ্ধা-অবোদ্ধা নির্বিশেষে সবাই। 'চোখের বালি' হয়ে ওঠে ঋতুপর্ণ ঘোষের ক্লাসিক ছবিগুলোর একটি। আর এদিকে 'অশ্লীলতার জোয়ারে' ভাসতে থাকা

আমাদের ঢাকাই চলচ্চিত্র নিয়ে আক্ষেপের জোয়ারেরও শেষ থাকে না ওই একই 'চলচ্চিত্রবোদ্ধা' শ্রেণির। দশকজুড়ে চলতে থাকে এই বিলাপ। বাংলা সিনেমা হয়ে যায় 'ছিঃনেমা'।[১] সুশীল সমাজ, এলিট মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের 'রুচিশীল' মানসিক প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগীয় কায়দায় যৌনতা-ভালগার উৎপাদী চলচ্চিত্রগুলো এক্কেবারেই 'ছিঃ'-এর কাতারে চলে যায়। এই শ্রেণির দর্শকদের কাছে ঢাকাই চলচ্চিত্রগুলোর 'প্রারম্ভিক টাইটেল' থেকে শুরু করে 'খোদা হাফেজ' পর্যন্ত সবকিছুই হাস্যরসের খোরাক হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।

যাই হোক, সেই সময়ে অর্থাৎ ২০০৩ সালে আমি নিজেই ৭-৮ বার চলচ্চিত্রটি (চোখের বালি) দেখেছি। সিডি কিনে সংগ্রহে রেখেছি। বলতে বাধা নেই, চলচ্চিত্রটির কামপ্রবণ জায়গাগুলোই আমাকে আলাদা করে টেনেছিল। বন্ধুদের ডেকে ডেকে চলচ্চিত্রটি দেখিয়েছি। চলচ্চিত্রবিষয়ক এলিট দীক্ষায় আরো অনেকের মতো আমার মনও মানতে বাধ্য হয়েছিল যে, বিছানাদৃশ্যের শিল্পিত রূপায়ণমাত্রই আর্ট।

কিন্তু 'চোখের বালি' মুক্তি পাবার ৭ বছর পরে যখন 'চোখের বালি' উপন্যাসটি আবার নতুন করে পড়তে বসি, তখন বহুদিন আগে ৭-৮ বার দেখা সেই চলচ্চিত্রটির কিছু খটকার পাশাপাশি উপন্যাস-চলচ্চিত্রের তুলনা থেকে জাত কিছু নতুন প্রশ্নও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। গেল দশকে বাংলার প্রায় ক্লাসিক হিসেবে মর্যাদা পাওয়া চলচ্চিত্র 'চোখের বালি'র যৌনতা নিয়ে ৭ বছর আগের পুরানো সেই অনুভূতি আর আজকের প্রশ্ন ও খটকাগুলোকে সাজিয়ে উপস্থাপনের লোভ আমি এড়াতে পারি না। আবার এর সাথেই মাথায় ঘুরতে থাকে সম্প্রতি আমার দেখা গত দশকের এফডিসির বাংলা চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত যৌনতার প্রশ্ন। আর তাই অপটু হাতে লিখতে বসি রবীন্দ্রনাথ ও ঋতুপর্ণের 'চোখের বালি' এবং ঢাকাই চলচ্চিত্রের যৌনতা নিয়ে। না, কোনো সমালোচনাত্মক গূঢ় আলোচনা উত্থাপনের মতো জায়গা থেকে নয়, বরং মনের অবচেতনে 'চোখের বালি'কে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্রে যৌনতা, রুচি ও পুরুষাধিপত্যসংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলো আমার মনে উত্থাপিত হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো গুছিয়ে উপস্থাপন করা এবং ঢাকাই চলচ্চিত্রের যৌনতা থেকে এর আদতে ফারাকটা কোথায়, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই লেখাটি লিখতে বসা।

আরো বলে রাখতে চাই, এই আলোচনার ক্ষেত্রে 'চোখের বালি' আমার কাছে শুধু একটি নির্দিষ্ট চলচ্চিত্র নয়, বরং এটি হলো 'আর্টফিল্ম' ও 'ভালোফিল্ম'-এর সেই প্রতিনিধি, যার মধ্যে সমসাময়িক সকল ভালোফিল্মের যে ধারা[২], তার উপাদান প্রায় পুরোমাত্রায় উপস্থিত। এই চলচ্চিত্রটির জন্য যে প্রশ্নগুলো তুলেছি, তা এই ধারার অন্যান্য নির্মাতার অন্যান্য ফিল্মের জন্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বটে।

২. ঋতুপর্ণের 'চোখের বালি' : পুরুষাধিপত্যবাদী যৌনতার চলচ্চিত্র

'চোখের বালি' উপন্যাসে আমরা দেখি আশালতার সাহায্য নিয়ে গোপনে বিনোদিনীর ছবি তুলবার সময় কীভাবে 'আর্টের খাতিরে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৯, ২৮) মহেন্দ্র বিনোদিনীর চুল স্পর্শ করে

---

[১] প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত 'আলপিন'-এ এই শিরোনামেই ঢাকাই চলচ্চিত্রসংক্রান্ত ঝাঁঝালো সমালোচনাত্মক সিরিজ বক্তব্য লিখিত আকারে পেশ করতেন অনিন্দ্য জাফরি।

[২] চাইলে অঞ্জন দত্তের 'রঞ্জনা আমি আর আসব না', মৈণাক ভৌমিকের 'বেডরুম', শ্রীজিৎ মুখোপাধ্যায়ের '২২শে শ্রাবণ'সহ সমসাময়িক চলচ্চিত্রগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

বিনোদিনীকে ছুঁয়ে দেখবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছিল। ঠিক মহেন্দ্রর মতো সেই একই আর্টের খাতিরেই ঋতুপর্ণ ঘোষও 'চোখের বালি' চলচ্চিত্রে চিত্রায়ণ ঘটালেন প্রবল পুরুষাধিপত্যবাদী যৌনতার। যৌনতাকে মোড়ালেন গহনা, আলতা, সাদা মশারি, চুম্বক, মখমল, লুকোচুরি, আভিজাত্য, পাশ্চাত্য আধুনিকতা, দেশপ্রেম, বৈধব্যের যাতনা, সর্বোপরি 'নারীবাদ'-এর মিশেলে নির্মিত এক রংচঙে ককটেল মোড়কে; সাথে জুড়ে দিলেন চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট তাঁর অসাধারণ টেকনোলজিক্যাল জ্ঞান, দারুণ কিছু রাবীন্দ্রিক আবহসংগীত আর অভিনয়ের জন্য নিলেন চোখধাঁধানো সব পারফরমার। বলতে বাধা নেই, এই অসাধারণ আঙ্গিকে টেকনোলজিক্যাল প্রয়োগ, তদুপরি নির্মাণশৈলীর অসাধারণ নৈপুণ্যের কারণেই হয়তবা ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্রে একবার চোখ রাখলে সেখান থেকে চোখ ফেরানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অন্ততপক্ষে আমার তো সেরকমই হয়। আর তাই, এই প্রবল টেকনোলজির আড়ালে হারিয়ে যায় 'চোখের বালি' চলচ্চিত্রে ঋতুপর্ণের তৈরি করা প্রবল পুরুষতান্ত্রিক যৌনতানির্ভর টেক্সট। এলিট দীক্ষায়ণের প্রবল ধাক্কায় বিছানাদৃশ্যের পুরুষাধিপত্যিক চিত্রায়ণকে শুধু আর্টই মনে হতে থাকে।

একটু বলে রাখি, নারীপন্থী নির্মাতা হিসেবেই ঋতুপর্ণ পরিচিত হতে পছন্দ করেন। সকলের সামনে তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরেন 'নারীসুলভ পুরুষ' (সৌভিক মিত্রা, ২০০৯) হিসেবে। এরই অংশ হিসেবে তিনি নিজেকে প্রচুর গহনা, আংটি ও কাজলে সাজিয়ে রাখেন, যা মূলত নারীরই পোশাক বলে ঋতুপর্ণ মনে করেন। এছাড়া নারীর আচরণসম্পর্কিত প্রচলিত যে বাকধারা, চিন্তাধারা বা ডিসকোর্স, তার প্রভাব আমরা ঋতুপর্ণের আচরণের মধ্যে প্রবলভাবে লক্ষ করি। এছাড়া ঋতুপর্ণের অধিকাংশ চলচ্চিত্র 'তিত্‌লী', 'বাড়ীওয়ালী', 'অন্তরমহল', 'চোখের বালি', 'সব চরিত্র কাল্পনিক', ইত্যাদির কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী; যেখানে শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা দেখি নারীর স্বরই প্রতিষ্ঠিত করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন অবিন্যস্ত হয়ে যায়। চলচ্চিত্রের এক পর্যায়ে নারীকণ্ঠেই শুনতে পাই পুরুষ স্বর, দেখতে থাকি নারীর হেরে যাওয়া, নারীর মৃত্যু। 'নারীসুলভ পুরুষ' ঋতুপর্ণে অন্তর্নিহিত যে নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব, যে লড়াই, সেখানে অবশেষে জয় হয় পুরুষেরই।

চলচ্চিত্রটিতে উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে নিজ আঙ্গিকে বিন্যস্ত করেছেন ঋতুপর্ণ। সাজিয়েছেন সম্পূর্ণ নিজের মতো করে। আমাদের সামনে একে একে হাজির করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের নারী অবমূল্যায়ন, বিধবার 'চায়ের নেশা' বনাম 'শরীরের ছোকছোকানি', ইংরেজি শিক্ষার সাথে বৈধব্যের সম্পর্কজনিত কুসংস্কার, বিধবার লাল চাদর ও চকলেট খাবার দৃশ্য, দেশভাগ, নরেণ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), জগদীশ চন্দ্র বসু, বজরা, ইংরেজ সিস্টার-ডাক্তার, গর্ভপাতসম্পর্কিত আলোচনা, গহনার অতি আড়ম্বর, আশালতার গর্ভধারণ, যৌনতা ও নারীর মাসিকসংক্রান্ত প্রসঙ্গ ছাড়াও আরো কিছু বিষয়, যেগুলো আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে খুঁজে পাই না। আরো মজার বিষয় হলো এই যে, এতসব বাড়তি প্রসঙ্গের মধ্যেও কিন্তু যৌনতাকেন্দ্রিক টেক্সট ও চিত্রায়ণই আরো বাড়তি মাত্রা নিয়ে ঘুরেফিরে চলচ্চিত্রে এসে হাজির হতে থাকে।

আমরা জানি যে, উপন্যাস অবলম্বনে বা উপন্যাস থেকে সরাসরি চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে নিজের মতো করে চিত্রনাট্য লিখবার। ঋতুপর্ণ সেই স্বাধীনতা ষোলোআনাই ভোগ করেছেন। যেকোনো নির্মাতাই তা করেন। তাই চলচ্চিত্রে বাড়তি প্রচুর জিনিস (বিশেষত যৌনতা) যেমন যুক্ত হয়েছে, তেমনি 'চোখের বালি' উপন্যাসে উপস্থাপিত প্রধান চারটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অনেক ব্যাখ্যার অধিকাংশ বাদও গিয়েছে। ঋতুপর্ণ উপন্যাসের অনেক জায়গাকে পরিশীলিত করে নিজস্ব চেতনানুসারে নারীপন্থী অবয়ব দেবারও চেষ্টা করেছেন বটে (বিস্তারিত

আলোচনা ২.১-এ)। কিন্তু চলচ্চিত্রটিতে একদিকে যেমন বিনোদিনীকে নারীপন্থী চরিত্র হিসেবে নির্মাণের তৎপরতা দেখি, ঠিক তেমনি পুরুষাধিপত্যের দীক্ষায়ণকে প্রতিহত করতে না-পারা 'নারীবাদী ঋতুপর্ণ' তাঁর চলচ্চিত্রে একই সাথে নারীকে উপস্থাপন করতে থাকেন যৌনবস্তু হিসেবে। আর তাই চলচ্চিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্লাউজহীন শাড়িপরিহিত বা সঙ্গমপরবর্তী-পূর্ববর্তী বা সঙ্গমরত স্ট্যান্ডার্ড মাপের নারীশরীর আংশিক নগ্নভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে থাকে, যেখানে স্পষ্টতই এই নারীচরিত্রগুলোকে বাস্তবঘেঁষা করবার যে ঝোঁক তার চেয়ে প্রদর্শনের ঝোঁকটাই বেশি ধরা পড়ে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, নারী নিজে নিজের যৌন আবেদন ও যৌন আকাঙ্ক্ষাকে উপস্থাপন করলে আমার সমস্যা নেই। তবে চলতি স্ট্যান্ডার্ড মাপসহ শুধু নির্ভরশীল ও যৌননির্ভর চরিত্র হিসেবে নারী উপস্থাপিত হলে আমার সমস্যা আছে, যৌন আবেদনের সংজ্ঞা বাজারনির্ধারিত মাপের আড়ালে হারিয়ে গেলে আমার সমস্যা আছে, নারী শুধু বাজারি পণ্য বা যৌনদাস হয়ে উঠলে আমার সমস্যা আছে। পাশ্চাত্যের পুরুষাধিপত্যশীলতার ছাঁচে বাজারের মাপে নারীর শরীরসর্বস্ব উপস্থাপন আমাকে কষ্ট দেয়।

যাই হোক, ঋতুপর্ণের 'চোখের বালি'র মূল প্রবণতা বা ঝোঁকটুকু আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে এই চলচ্চিত্রের প্রধান চারটি চরিত্রকে আমি আলাদা করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

২.১ ঋতুপর্ণের বিনোদিনী : বিধবাবসনে 'বিশ্বসুন্দরী'র স্ট্যান্ডার্ড মাপের আবেদনে হিংসা, পরকীয়া ও দ্রোহের গন্ধমেশানো যৌনপ্রধান চরিত্র

চলচ্চিত্রটিতে বিনোদিনী চরিত্রটির চিত্রায়ণে যৌনতাই মূল উপজীব্য। ক্রমান্বয়ে আমরা দেখতে থাকি 'বিশ্বসুন্দরী'র শরীরী আবেদনের বিভিন্ন আঙ্গিকের নানা ভঙ্গি। দেখি তাঁর উদোম গায়ে 'জামা' চাপানোর দৃশ্য, খোলা পিঠের জেল্লা, সঙ্গমপরবর্তী বুকের দাগ, মাসিকের চিহ্ন, এলোচুলে একাকী শরীর রোমন্থনসহ পরকীয়ার লুকোচুরি। এই লুকোচুরির বিস্তৃতি চলচ্চিত্রটির সর্বত্র। আর তাই শিশু বসন্তকে ঘুমাতে না-পাঠিয়ে (যেখানে উপন্যাসে পড়েছিলাম শিশু বসন্তকে বিশেষ ওই সময়ে ঘুমাতে পাঠায় বিহারী।) বিনোদিনীর সাথে 'হাইড অ্যান্ড সিক' খেলানোতেই ঋতুপর্ণের ঝোঁক প্রবল। ঠিক যেমন পুরো চলচ্চিত্রজুড়ে দর্শকের সাথে বিনোদিনীর মধ্য দিয়ে যৌনতাকেন্দ্রিক লুকোচুরি (বিস্তারিত আলোচনা ৩-এ) খেলায় মেতে থাকেন তিনি। আবার বিনোদিনীর মানসিক টানাপোড়েন, হিংসার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেয়ে প্রচুর গহনায় সাজিয়ে 'বিশ্বসুন্দরী'র রূপের ঝলকানি প্রদর্শনেই ঋতুপর্ণের আনন্দ সর্বোচ্চ।

আবার বিনোদিনী চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে ঋতুপর্ণ কর্তৃক নির্বাচিত ঐশ্বর্য রাই অভিনয়ের চেয়ে শরীর প্রদর্শনেই বেশি পারদর্শী বলে আমার মনে হয়েছে। উপরন্তু, তাঁর বাংলা ভাষা না-জানা চরিত্রটি বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর জন্য একটি বাধা তৈরি করেছে এটা স্পষ্ট। সুতরাং ঐশ্বর্য রাই চরিত্রটির বাঁক, মনস্তত্ত্ব, টানাপোড়েন একেবারেই ধরতে পারেন না। আর তাই বিনোদিনী চরিত্রটি আগাগোড়াই কৃত্রিমতায় ভরা প্রাণহীন পুতুল চরিত্র মনে হতে থাকে। উপরন্তু, বাঙালি নারীশরীরের যে কাঠামো, তা ঐশ্বর্যের মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। বিশ্ববাজারে বিকিকিনি করার স্ট্যান্ডার্ড মাপের শরীরের অধিকারী ঐশ্বর্যের মধ্যে চলতি বাজারের প্রায় সব উপাদান ষোলোআনাই উপস্থিত থাকলেও ঋতুপর্ণ তাঁর মধ্যে বিনোদিনীর কী কী বৈশিষ্ট্য/উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন, তা আমার একেবারেই বোধগম্য হয় না।

আবার বিনোদিনীকে নিজের মতো করে অধিকার সচেতন ও সোচ্চার নারী অবয়ব দেবারও চেষ্টাও করেছেন ঋতুপর্ণ। তাকে তিনি পরিয়েছেন লাল চাদর। লুকিয়ে তাকে খেতে দেখি চকলেট, চা। শরীরের চাহিদাকে চায়ের তৃষ্ণার সাথে একাকার করে জোরালো কণ্ঠস্বরেও আবির্ভূত হতে দেখি তাকে। ধর্মকেও অস্বীকার করার ঝোঁক লক্ষ করা যায় তার মধ্যে, স্বামীর মৃত্যুতিথিতে পূজোর নাম করে মহেন্দ্রর সাথে গোপনে মিলিত হতে যায় সে। স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করতে কুণ্ঠা নেই তার। সবশেষে কারো সাহায্য ছাড়া একাই 'দেশের কাজ'-এ বেরিয়ে পড়ে ঋতুপর্ণের বিনোদিনী। চলে যায় আড়ালে। অন্তরালে চলে যাবার কারণ জানিয়ে যায় সে। না, কোনো পুরুষকে নয়, আরেক নারীচরিত্র আশালতাকে। নারী হিসেবে তার টানাপোড়েন অন্য এক নারীর পক্ষেই যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব বলেই হয়ত-বা।
কিন্তু এই এতটুকু বাদ দিলে এই চলচ্চিত্রের দৃশ্যায়নে, চিত্রায়ণে সর্বোপরি যৌনতাভিত্তিক টেক্সট রচনার ক্ষেত্রে ঋতুপর্ণের জোরালো পুরুষসত্তা সদা উপস্থিত। তাঁর এই সত্তাটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে যে, সেই আধিপত্যের আড়ালে অল্পবিস্তর নারীর স্বর যাও-বা শোনা গিয়েছিল, তা কেমন যেন হারিয়ে যায়। ফলে চলচ্চিত্রটিতে পুরুষাধিপত্যশীল যৌনতা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এর সাথে নারী রূপান্তরিত হয় কেবল যৌনবস্তুতে। বিনোদিনী হয় এই চলচ্চিত্রে এই প্রক্রিয়ার প্রধান বলি।

২.২ আশালতা : অধস্তনতাই নিয়তি যার

ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্রে আশালতা চরিত্রটিকে অনেকখানি উপন্যাসঘেঁষা বলে মনে হয়। বিনোদিনী চরিত্রটিকে যেমন ভেঙেচুরে ঋতুপর্ণ একেবারেই নতুন অবয়ব দিয়েছেন, আশালতার ক্ষেত্রে তা প্রায় ঘটে নি বললেই চলে। তবে আশালতার সরল, বোকা বোকা চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত করতে ঠাকুর যেমন নানান মানবীয় অনুষঙ্গ হাজির করেছিলেন, ঋতুপর্ণ কিন্তু সেই একই চরিত্রকে তাঁর চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেন সম্পূর্ণ পুরুষাধিপত্যশীল যৌনতার পাটাতনে। তাই আশালতা চলচ্চিত্রের পরিসরেও যেমন একটি পুরুষাধস্তন চরিত্র (প্রায় সারাটা উপন্যাসজুড়েও তাই), ঠিক তেমনি দর্শকের কাছেও সে হাজির হয় যৌনবস্তু হিসেবেই। দর্শকের সামনে তাঁর আবির্ভাবই ঘটে বিছানায় সঙ্গম দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। এরপর বাজারি স্ট্যান্ডার্ড মাপের 'সোনার বরণ' (ঋতুপর্ণ ঘোষ; ২০০৩) শরীর নিয়ে আশালতাও দর্শকের সামনে হাজির হতে থাকে ব্লাউজহীন উদোম শরীর, বুকে দাগ, দরজা বন্ধ, চুম্বক-চুম্বন, প্রচুর গহনা, সর্বোপরি মহেন্দ্রর বোকা বোকা অধস্তন কামসঙ্গী হিসেবে। শেষ পর্যন্ত যৌনতার পরিসরের এই অধীন জায়গাটাই ফিরে পাবার এক অদৃশ্য লড়াই জারি থাকে আশালতার মাঝে। অতঃপর গর্ভে 'মহেন্দ্রসন্তান' ধারণের মধ্য দিয়ে তার হারানো জায়গা পুনরুদ্ধার করে সে (উপন্যাসে যদিও এমন কোনো উল্লেখ নেই)। উপরন্তু, উপন্যাসের শেষে আশালতার ব্যক্তিত্বের প্রবল যে বাঁক লক্ষ করি, চলচ্চিত্রে যা অনুপস্থিত।

আবার চলচ্চিত্রে আশালতাকে বিনোদিনীর অনুষঙ্গ চরিত্রই মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে। মনে হতে থাকে, বিনোদিনীকে প্রতিষ্ঠিত করতেই আশালতা চরিত্রটির আবির্ভাব ঘটেছে চলচ্চিত্রে (উপন্যাসে কিন্তু তা মনে হয় না, সেখানে আশালতা স্বতন্ত্র চরিত্র)। এর কারণ বিনোদিনী চরিত্রটির প্রতি ঋতুপর্ণের ছিল আলাদা মনোযোগ। আর তাই করপোরেট মিডিয়া নির্মিত ধুন্ধুমার ঐশ্বর্য-জেল্লার কাছে অনেকখানিই ম্রিয়মাণ হয়ে যান মুম্বাইয়ের বিভিন্ন ফ্লপ ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেনের নাতনী রাইমা সেন।

২.৩ ‘নারীসুলভ পুরুষ’ ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্রে কামুক মহেন্দ্র-সতী বিহারী : একই পুরুষাধিপত্যিক চরিত্রের এপিঠ ওপিঠ

চলচ্চিত্রটির পুরুষপ্রবণ চিত্রায়ণের পাশাপাশি যে এই চলচ্চিত্রের টেক্সটও প্রবলভাবে পুরুষাধিপত্যকেই উৎপাদন করে তা একটু লক্ষ করলেই স্পষ্ট হয়। আর এই পুরুষাধিপত্যের প্রধান প্রতিভূ হিসেবে আবির্ভূত হয় চলচ্চিত্রের দুটো পুরুষ চরিত্র। উপন্যাসে বিহারী চরিত্রটিকে একটি ‘সতী’মার্কা ‘আদর্শ’ পুরুষচরিত্র হিসেবে দেখানোর ঝোঁক প্রবলভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই লক্ষ করি। এই সতী বিহারী আবার প্রবল পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার অধিকারীও বটে। এরই ছোটখাটো নমুনা হিসেবে উপন্যাসের অন্তর্গত বিহারীসংক্রান্ত দু’-একটা জায়গা হাজির করতে চাই। বিনোদিনী এক পর্যায়ে মহেন্দ্র-আশালতার সংসার থেকে পালিয়ে বিহারীর কাছে ‘আশ্রয়’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৯, ৭৯) নিতে যায়। সে সময় বিনোদিনীর সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে বিহারী বলে ওঠে—

“কিন্তু নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না”, অর্থাৎ নারীসংক্রান্ত সেই সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রকট চিত্রায়ণ। অবাক না-হয়ে পারি না, রবীন্দ্রনাথ এই টেক্সট লিখছেন! ‘নায়িকা-শোভা-ঘর-লইয়া চলে না’ শব্দগুলো পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় : প্রথমত, স্টেজের নায়িকা ভালো ‘জিনিস’ হয় না; দ্বিতীয়ত, নারী শোভাবর্ধক শোপিস মাত্র; তৃতীয়ত, ঘরপ্রাপ্তি (এক পুরুষের অধীনত্ব স্বীকার করা) হবে নারীর একমাত্র আরাধনা; এবং সর্বশেষ, পুরুষ কর্তৃকই নির্ধারিত হবে নারীকে সেই ঘরে ‘লওয়া’ আদৌ সম্ভব কি না? (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৯, ৮০)। আবার উপন্যাসের আরেক পর্যায়ে বিহারী বলছে— “অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়ো না। সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যাহা বলে, তাই করো। দেশে চলিয়া যাও।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৯, ৮০)। এখানে তো প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, ‘অসাধারণ’ কিছু তবে কারা করবে? পুরুষ? ‘শুভবুদ্ধি’ কী? প্রেম না-করা? বিধবা হয়ে শরীরের জ্বালা নিয়ে নির্ভৃত গৃহকোণে নিজেকে তিল তিল করে শেষ করা? সহনশীল হওয়া? যা উপন্যাসের সমাপ্তিতে বিনোদিনীর পরিণতি হিসেবেই আমরা দেখি। সে ‘ভালো’ ও ‘সহনশীল’ হয়ে ওঠে। তার আর কোনো বিদ্রোহ নেই।

যাহোক, বহুগুণে গুণান্বিত সমাজসেবী, উদার ও সহনশীল বিহারীর এই হলো পুরুষাধিপত্যিক ‘গুণ’। পুরো উপন্যাসজুড়ে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যধারা চাইলেই আরো খুঁজে পাওয়া যাবে। তো এখন, ঋতুপর্ণ, এই বিহারীকে নিয়ে কী করলেন, একটু দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথের টেক্সটকে নানান নিরীক্ষায় ফেলে পোস্টমর্টেম করলেও এই পুরুষ বিহারীকে চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে ঋতুপর্ণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এতটুকু অতিক্রম করলেন না, টানাটানিও করলেন না। আরো বেশি অবাক হয়ে লক্ষ করি যে, অতিক্রম করা তো দূরের কথা, বিহারী চরিত্রটিকে তিনি মাঝবয়সী রবীন্দ্র আদলে গড়ে তুললেন। চেহারার সেই গড়ন, দীর্ঘাঙ্গ, মুখের দাড়ি-গোঁফ সব মিলিয়ে এ যেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিমূর্তি। অর্থাৎ এই চলচ্চিত্রে বিহারী হলো সেই নিরপেক্ষ চরিত্র, যা ঔপন্যাসিকের ভাবনার প্রতিচ্ছবি হিসেবে চলচ্চিত্রকার ভাবছেন।

আবার শরীর প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ঋতুপর্ণ কিন্তু একপেশে নন মোটেই। এটা প্রমাণ করতেই হয়ত-বা বারকয়েক পুরুষ শরীরও দেখালেন তিনি, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। একবারে চলতি স্ট্যান্ডার্ডের ছাঁচে ফেলে। যে পুরুষ মুগর ভাঁজে, যে কিনা শক্তিধর, ‘অবলা নারীর’ (ঋতুপর্ণ; ২০০৩) পরিত্রাণকর্তা ইত্যাদি গুণাবলি যার মধ্যে আছে ষোলআনা। ইনি বিহারী। আর এই সতী বিহারী ‘অবলা নারী’র

‘পরিত্রাণ’-এর (ঋতুপর্ণ; ২০০৩) নিমিত্তে পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলতে ঝাঁপ দেন, এবং বিনোদিনী তার কাছে ‘আশ্রয়’ চাইতে গেলে আরো স্পষ্ট করে নিজের সতীত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

আর এদিকে মহেন্দ্রকে হিংসাপরায়ণ, অহংকারী, একগুঁয়ে, আত্মকেন্দ্রিক, সর্বোপরি কামুক আদল দিলেন ঋতুপর্ণ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যদিও-বা মহেন্দ্রকে অনেকটা এরকমই দেখি, কিন্তু ঠাকুর তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী বর্ণনায় মহেন্দ্রকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। সেখান থেকে মহেন্দ্রকে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। এই সবকিছুর মাঝে মহেন্দ্রর মানসিক টানাপোড়েন সেখানে স্পষ্ট। কিন্তু চলচ্চিত্রে খুব একপেশেভাবে মহেন্দ্রর কামুক চরিত্রই প্রধান হয়ে ওঠে। সতী বিহারী বনাম কামুক মহেন্দ্র টানাপোড়েনের বৃত্তে পুরুষ ঋতুপর্ণের ‘নারী সত্তা’ আবর্তিত হতে থাকে। কখনো বিহারী কখনো মহেন্দ্রর চোখে নিজের চোখ প্রতিস্থাপন করে তিনি দেখতে থাকেন বিনোদিনী-আশালতাকে। কিন্তু এই যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি, তা-ও একটি নির্দিষ্ট অনুভূতিতে একীভূত হয়ে চরম অনুনাদ তৈরি করে, যে অনুভূতির পাটাতনে দাঁড়িয়ে দুটো পুরুষচরিত্রকে আর আলাদা করা সম্ভব হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আপাতদৃষ্টিতে নারীপন্থী বলে ভ্রম হতে থাকলেও তা আদতে পুরুষাধিপত্যকেই বহন করে চলে। যার প্রমাণ পাই চলচ্চিত্রটির চিত্রায়ণ, দৃশ্যায়ন, টেক্সট থেকে চরিত্র নির্বাচন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে। আর তাই চলচ্চিত্রের প্রথম কথোপকথনের ধরনটাই এরকম—

(বিহারী উপন্যাস পড়ছে)

বিহারী : রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলো দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত। আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে পাড়ার একমাত্র অবলম্বন...

মহেন্দ্র : এবং এইসব গুণাবলির জন্য অবশেষে তাহাকে মরিতে হইল।

মা : তা বিধবা অশুচি করে বেড়াবে, ভগবান তাঁকে শাস্তি দেবে না?

মহেন্দ্র : ভগবান এত সহজে মৃত্যুদণ্ড দেয় না মা, হাকিম দেয়। বঙ্কিমবাবু হাকিম ছিলেন জানো তো?

মা : নবেল লিখলে ওরকম একটু সাজিয়ে লিখতে হয়। আমাদের মতো ছা-পোষা একাদশী করা বিধবাদের নিয়ে গপ্পো লিখলে আজকালকার ছেলেদের মন উঠবে?

মহেন্দ্র : আজকালকার ছেলেদের মন এমনিতেও উঠবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের একটাও মেয়ে ইংরেজি জানে না।...

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রথম আলো’ উপন্যাস পড়ে জেনেছিলাম, সে সময় বঙ্কিমচন্দ্র নাকি যুগের তুলনায় অর্বাচীন রবীন্দ্রনাথের লেখনী ঠিক পছন্দ করতে পারতেন না। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকাতেও এই টানাপোড়েনের গন্ধ পাই। এমনও হতে পারে ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘চোখের বালি’ উপন্যাসটি লিখেছেন। (যেহেতু ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসটি আমার পড়া নেই, তাই অনুমান করছি) সেই বঙ্কিম-ঠাকুর টানাপোড়েনকেই

নারীবাদী আঙ্গিকে হাজির করতে চাইলেন ঋতুপর্ণ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তিনি এখানেও তাঁর চিন্তাভাবনাকে পুরুষাধিপত্যশীল যৌনতার বাইরে ধাবিত করতে পারলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেও সেই টেক্সটটুকু টুকে নিলেন, যেখানে প্রথমেই নারীর যৌবনের প্রশ্ন হাজির হলো। নারীসম্পর্কিত বিশেষণগুলো একটু লক্ষ করা যাক— 'যৌবন পরিপূর্ণ', 'রূপ উছলিয়া', 'শরতের চন্দ্র' এবং 'অল্প বয়স'। এর পরই এই বিতর্কের বিষয়টা দাঁড়াল 'আজকালকার ছেলেদের মন ওঠা' প্রসঙ্গ নিয়ে। কথা শুনে মনে হতে থাকল উপন্যাসের পাঠকমাত্রই পুরুষ। তখনকার দিনের সমাজ বাস্তবতায় একথা অস্বীকার করি না যে, অধিকাংশ পাঠকই পুরুষ ছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রটির এই টেক্সট কিন্তু নির্মিত হচ্ছে উপন্যাসটি লেখারও ষাট বছর পরে। আর আগেই বলেছি ঋতুপর্ণ তাঁর চলচ্চিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যটি করেছেন সম্পূর্ণ নিজের মতো করে। সুতরাং সেই সময়ের সমাজ-বাস্তবতার কথা যদি উঠে আসে, তবু কিন্তু নিজের দায়টা এড়ানো সম্ভব হয় না।

এছাড়া এর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বিধবা হয়েও 'এতসব গুণাবলি'র অধিকারী হবার কারণে রোহিণীর মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় 'হাকিম বঙ্কিমবাবু'কে নিয়ে শ্লেষ করা মহেন্দ্রকে ক্ষণিকের জন্য কিন্তু নারীবান্ধব মনের অধিকারী বলে মনে হয়। কিন্তু পরের কথাতেই মহেন্দ্র তথা ঋতুপর্ণ স্বরূপে ফেরেন। মহেন্দ্র স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আজকালকার ছেলেদের মন ওঠাতে হলে নারীর শারীরিক 'রূপ'-এর পাশাপাশি শিক্ষার জেল্লাও প্রয়োজন। এ হলো নারী সম্পর্কে সমাজের সেই আদি কর্তৃত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যেখানে নারী মূলত ঘরের পোষা ময়নাবিশেষ, যে ময়না আবার কথাও কইতে জানে, গানও গাইতে জানে। আর পুরুষ এই ময়নার ওপর মালিকানা আরোপ করে মুগ্ধ হয় এবং অহংকারের সাথে প্রকাশ করতে থাকে— এ কথা কওয়া, গান গাওয়া পাখি শুধুই আমার।

৩. 'চোখের বালি'তে সুশীল-শ্লীল রুচির যৌনতা বনাম ঢাকাই চলচ্চিত্রের 'অশ্লীলতা'

'চোখের বালি' উপন্যাসে যে পরিমাণ যৌনতার প্রয়োগ আমরা দেখেছি তাঁর চেয়ে বহুলাংশে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এবং কোথাও-বা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দৃশ্য সংযোজনের মাধ্যমে ঋতুপর্ণ যৌনতার প্রদর্শনী চালিয়েছেন, যেখানে পুরুষই সর্বময় কর্তা, যা এই চলচ্চিত্রে ইতিবাচকভাবেই চিত্রায়িত হয়েছে। একটি বিষয় একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, চলচ্চিত্রটি দেখে শেষ করার পর অধিকাংশ দর্শকের কাছে বিনোদিনী-মহেন্দ্র বা আশালতা-মহেন্দ্রর যৌনদৃশ্যগুলোই কেবল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।[৩] অর্থাৎ এই চলচ্চিত্রটির ক্ষেত্রে আর সব উপাদান বাদ দিয়ে দর্শকের চোখে ফোকাস হয়ে ওঠে কেবল যৌনতার সুড়সুড়িটুকু। সমগ্র চলচ্চিত্রটিতে টেকনিক্যালি এবং ডায়ালগের মধ্যে এমন একটি আবহ তৈরি হয় যে, দর্শকের পক্ষে এই যৌনতার বাইরে চিন্তা করাটাই কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই আবহের সূত্রপাত ঘটে চলচ্চিত্রের শুরুতেই পর্দায় বিয়ের মঞ্চে বিবাহউত্তেজনায় বিনোদিনীর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মধ্য দিয়ে। এর পরের দৃশ্যেই অবশ্য বিধবা বিনোদিনীর দেখা মেলে। শুরু হয়

[৩] উঠতিবয়সী, বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া বা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করা বেশ কিছু দর্শকের সাথে আমি 'চোখের বালি' ও 'অন্তরমহল' নিয়ে সচেতনভাবে কথা বলে দেখেছি, তাদের কাছে মূল আকর্ষণ এবং চলচ্চিত্রটি নিয়ে কথার কেন্দ্রস্থল হলো বিনোদিনী (ঐশ্বর্য রাই) ও বড়োবউ (রুপা গাঙ্গুলী)-র মাসিক, শরীরী উপস্থাপন ও সঙ্গমদৃশ্য এবং মহেন্দ্র (প্রসেনজিৎ), বিশেষত জমিদার (জ্যাকি শ্রফ)-এর আগ্রাসী-আক্রমণাত্মক যৌনতাসংক্রান্ত আচরণ।

চলচ্চিত্রটির মূল আখ্যানপর্ব। এই দৃশ্যেই আমরা দেখি বিনোদিনী ইংরেজ সিস্টারের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে সিস্টারের কথায় শরীরের খোলা অংশ কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়। এই ঢেকে নেয়া, আমাদের সমাজে নারীশরীরসংক্রান্ত প্রচলিত ডিসকোর্স বা বাকধারার অধীনের সেই বার্তাকেই হাজির করে যে, নারীশরীর ঢেকে-ঢুকে রাখার জিনিস; ভুলক্রমে সেটা বেরিয়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলাটাই উত্তম। পুরো চলচ্চিত্রজুড়ে একটু পরপরই বিনোদিনীর বেরিয়ে যাওয়া শরীর ঢাকার এই আড়ম্বর আমরা দেখতে পাই। আর এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ঋতুপর্ণ দর্শকের সাথে যৌনতাকেন্দ্রিক লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠেন।

ঋতুপর্ণ'র এই প্রবণতা কেবল 'চোখের বালি' চলচ্চিত্রেই নয়, বরং 'অন্তরমহল' চলচ্চিত্রে আরো প্রবলভাবে উঠে আসে। সেখানে আমরা দেখতে পাই, নতুন পটুয়া (অভিষেক বচ্চন) বাইরের বারান্দায় মূর্তি গড়বে বলে বাড়ির ছোটোবউয়ের (সোহা আলী খান) পোষা ময়নাকে দোতলার বাহির বারান্দা থেকে ভেতর বারান্দায় পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয় বড়োবউ । ছোটোবউ যখন জানতে চায়, 'কেন?' বড়োবউ জানায়, 'নিচে জোয়ান পোটো এয়েছে, তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে আর বগল তুলে পাখি খাওয়াতে হবে না।' (ঋতুপর্ণ ঘোষ, ২০০৬)। সুতরাং ঋতুপর্ণ নিজেই স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, তাঁর পরানো কস্টিউমে নারীর বগল দেখানোর আখ্যান। শরীরের যে গোপন স্থান 'জোয়ান পোটো' দেখলে সমস্যা হবে বলে দর্শকের মাথায় গেঁথে গেল, সে স্থানটাই (বগল) আরো ভালো করে দেখার জন্য দর্শকমনে কী পরিমাণ 'তুষ্টিপূর্ণ তাকানোর মতো আদিম ইচ্ছা' (লরা মালভি, ২০০৭) জাগ্রত হবে, নিশ্চয়ই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[৪]

আবার 'চোখের বালি'তে পাত্র-পাত্রীর নাম দেখানোর শেষেই চোখের সামনে চলে আসে বিছানার দৃশ্য। বিছানায় শুয়ে নবদম্পতির যৌনালাপ চলতে থাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে। উপযুক্ত কনে হয়ে ওঠার অংশ হিসেবে নারীশরীরের কী কী অঙ্গ পুরুষের নিরীক্ষার শিকার হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তার বর্ণনাই দিতে থাকে মহেন্দ্র। আশালতাও এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শিকার হতে পারায় পুলক বোধ করতে থাকে। এর পরপরই আমরা একজন ডাক্তারের করণীয় সম্পর্কেও জানতে পারি মহেন্দ্রর জবান থেকে। জানতে থাকি, একজন মেডিক্যালপড়ুয়া ছাত্রের কাজই হলো 'মেয়েদের গোড়ালি দেখা, কোমর দেখা এবং বুক দেখা।'

শুরুতে তা-ও তো এ হলো সমাজস্বীকৃত 'স্বকীয়া' প্রেমের বিছানার দৃশ্য, মানে বিবাহিত নারী-পুরুষের শরীরী প্রেমের উপস্থাপন; পরে এই প্রেমের রসায়ণ ঋতুপর্ণ পর্যবসিত করেন 'পরকীয়া'য় (উপন্যাসে এই প্রেমের যে উপস্থাপন, তার চেয়ে যা বিস্তর ফারাকে)। আর এই বিষয়টি আরো আরো প্রবল হয়ে ওঠে, যখন চলচ্চিত্রের যৌনতার অন্যতম উপাদান হিসেবে ঋতুপর্ণ ভয়ারিজম (লরা মালভি, ২০০৭) হাজির করেন। দর্শক দেখতে থাকে বিনোদিনী মহেন্দ্র-আশালতার বদ্ধ দরজার এপাশ থেকে দূরবীনের সাহায্যে ভেতরের দৃশ্যাবলি দেখার জন্য আকুলতা প্রকাশ করছে।[৫]

এদিকে কলকাতা থেকে গ্রামে বিহারীর উদ্দেশ্যে পাঠানো মহেন্দ্রর চিঠিটাও নারী-পুরুষের যৌনতার বর্ণনারই একটি টেক্সট (আবার বলছি, উপন্যাসের থেকে যে চিত্রায়ণ বিস্তর ফারাকে)। আবার

---

[৪] যাঁরা 'চোখের বালি' এবং 'অন্তরমহল'— এই দুটি চলচ্চিত্রই দেখেছেন, তাঁরা অবগত আছেন যে, চলচ্চিত্র দুটিতে নারী চরিত্রের কস্টিউমের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। এজন্যই এখানে 'অন্তরমহল'কে টেনে আনা।

[৫] এখানে এতটুকু না-বললে অন্যায় করা হবে যে, ঋতুপর্ণের ভয়ার একজন নারী; যা ভয়ারিজমের ধারণা অর্থাৎ ভয়ারমাত্রই একজন পুরুষ, সেই স্টেরিওটাইপড ধারণাকে চূড়ান্ত অর্থে ভেঙে ফেলে।

ঋতুপর্ণের প্রিয় লুকোচুরির আবির্ভাব। বন্ধুকে লেখা যে চিঠি মায়ের হাতে পড়ার কথা ছিল না, সে চিঠি মায়ের হাতে পড়ে গেল। মা চিঠিতে ছেলের প্রেমের বর্ণনা শুনে লজ্জায় মুখ ঢাকলেন, মুখ ঢাকলেন বিহারীও। সেই চিঠিই দীর্ঘ সময় ধরে রাত-দিন মিলিয়ে, লুকিয়ে, মিথ্যা বলে, সবার অগোচরে, ঘরে, ঘাটে, গির্জায়, বৃষ্টিতে, প্রকৃতির মাঝে পড়ে শেষ করল বিনোদিনী।

আরো একটি মজার বিষয় হলো, চলচ্চিত্রটিতে আশালতা-মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা একাধিক নগ্ন নারীপোর্ট্রেট, যা একটু পরপর চোখের সামনে হাজির হতে থাকে। এর মধ্যে একটি পোর্ট্রেট (একটি পূর্ণনগ্ন নারী) কয়েকবার করে আমাদের সামনে এসেছে; এবং আমরা দেখেছি একটু পরপরই চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রী সেই পোর্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়েই কথোপকথন করতে থাকে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ব্যাচেলরেও (মুস্তফা সরয়ার ফারুকী, ২০০৩) দেয়ালে টাঙানো নারীর একটি ন্যুডচিত্র দেখতে পাই একটু পরপর। 'যুবকরা কাঙ্ক্ষিত নারীর সাথে টেলিফোনে আলাপ করতে থাকলে পিছনের পোর্ট্রেটটা বারবার ফোকাসে চলে আসে।' (আ আল মামুন, ২০০৭, ১৩৯)। মজার ব্যাপার হলো, এক্ষেত্রে ফারুকী একেবারে চলতি বাজারে 'লঘু ধাঁচের' ন্যুড নির্বাচন করেছিলেন, যা সুশীল চোখে খুবই অশ্লীল দেখায়। এখানে একটু বলে রাখতে চাই, ন্যুড নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফারুকী যেমন চলতি বাজারসর্বস্ব, তেমনি তাঁর চলচ্চিত্রের টেক্সট, মেকিং, কাস্টিং সবই অত্যন্ত লঘু ধাঁচের (আমার কাছে অন্তত তেমনটাই মনে হয়)। ঋতুপর্ণ অতি অবশ্যই ফারুকীর চেয়ে শতগুণে যত্ন নিয়ে তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, একথা আশা করি আমার সাথে সাথে সবাই স্বীকার করবেন; এবং ঋতুপর্ণের সাথে ফারুকীর এই তুলনা অবশ্যই হঠকারিতার বহির্প্রকাশ হিসেবেই অনেকে বিবেচনা করবেন। কিন্তু চলচ্চিত্র দুটি একেবারেই আলাদা হওয়া সত্ত্বেও ন্যুড পোর্ট্রেট ও 'ভাষাকেন্দ্রিক যৌনতা' (আ আল মামুন, ২০০৭, ১৪০) নির্মাণসংক্রান্ত মিলটুকু আমার চোখ এড়ায় না। যদিও দুজনের পরিবেশনের ঢং একবারেই দুই মেরুর। ঋতুপর্ণ যত্নসহকারে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ধ্রুপদী আঙ্গিকে তাঁর ন্যুডগুলো উপস্থাপন করলেন। তিনি নিলেন গ্রিক পুরাণের দেবী ভেনাসের নগ্নতা, নিলেন মধ্যযুগীয় স্থূলাঙ্গী নারীর নগ্নতা, যার বৈধতা আমাদের এলিট কালচারে ষোলআনাই আছে। আর তাই তাঁকে সরাসরি কেউ আক্রমণ করার কথা ভাবতেও পারবে না। কিন্তু ছবিগুলো তিনি হাজির করতে থাকলেন মোক্ষম সময়গুলোতে। মহেন্দ্র তাঁর 'বউয়ের সোনার বরণ গা' (ঋতুপর্ণ, ২০০৩) পোকায় যেন না-খেয়ে ফেলতে পারে, সেজন্য নিয়ে আসা 'জামা' যখন আশালতাকে উপহার দিচ্ছে বা বিনোদিনী যখন 'জামা' পরে দেখাচ্ছে, তখন বিনোদিনীর সম্পূর্ণ খোলা পিঠ এবং সেই পোর্ট্রেটের খোলা সামনের অংশটুকু আমাদের সামনে একসাথে হাজির হতে থাকে। একই ঘটনা ঘটে বিনোদিনী যখন বিহারীর চিঠি পড়ে। আবার সেই গোটা পোর্ট্রেট দেখানোর পরই দেখতে পাই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে লাল মখমলের সেই জামা। অতঃপর সঙ্গমরত মহেন্দ্র ও আশালতাকে ফ্রেমে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখেন ঋতুপর্ণ।

আমরা সবাই জানি, ফিল্ম তৈরির ক্ষেত্রে ক্যামেরাই মূল হাতিয়ার। পাঠক জানবেন ক্যামেরা কিন্তু নিজেই একটা চোখ।[৬] একটি দৃশ্য সামনাসামনি আপনি যা দেখবেন, ক্যামেরা কিন্তু তা দেখাবে না। সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস ভিজ্যুয়ালাইজ করবে। ধরা যাক, আপনি টিভিতে 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা'

[৬] ঝিগা ভের্দভ নামের একজন সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার প্রথম 'ক্যামেরা নিজেই একটি চোখ' আখ্যা দিয়ে বলেন যে, ক্যামেরা প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরে। এই মতবাদ মাথায় রেখেই তিনি 'কিনো-আই' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন; এবং রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর পরিবেশে বেশ কিছু কাজ করেন। তবে বর্তমানে ক্যামেরার 'প্রকৃত বাস্তবতা' তুলে ধরার এই মতবাদ প্রায় মিথেই পরিণত হয়েছে। ক্যামেরা যে নিজের মতো বাস্তবতা নির্মাণ করে, তা আজ প্রায় সর্বজনবিদিত।

দেখছেন। এখানে কী দেখবেন, সেটা আপনি নিজে ঠিক করতে পারবেন না। ক্যামেরা আপনাকে নির্ধারণ করে দেবে কী দেখতে হবে। সেখানে আপনার সামনে আর কিচ্ছু না, নারীকে শুধু পণ্য এবং যৌনবস্তু হিসেবে তুলে ধরবে ক্যামেরা।[৭] একজন দক্ষ চলচ্চিত্রনির্মাতা ক্যামেরার এই ম্যাজিকেল ক্ষমতা সম্পর্কে অতি-অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল। ঋতুপর্ণও একজন দক্ষ নির্মাতা। ক্যামেরার এই জাদুর পুরোমাত্রার ব্যবহার তাই দেখি তাঁর চলচ্চিত্রে।

আবার এই ফিল্মগুলোতে ক্যামেরা একটি দৃশ্যের ওপর অনেকক্ষণ স্থির থাকে। পরিচালক যা তুলে ধরতে চান, তার প্রায় অনেকখানিই সেখানে তুলে আনা সম্ভব হয়। 'শিলা কি জওয়ানি' (ফারাহ খান; ২০১০)-তে ক্যামেরার মুভমেন্টের জন্য 'শিলা' (ক্যাটরিনা কাইফ)'র, যৌনতা যেভাবে উঠে আসে, তার থেকে বহুগুণে যৌনতা উৎপাদন করবে বিছানায় সঙ্গমরত নারী-পুরুষের ওপর স্থির ও ক্লোজশটে রাখা ক্যামেরা। আর এই স্থির দৃশ্যায়নের একটি ভাবগাম্ভীর্যময় রিপ্রেজেন্টেশন আছে। 'উন্নত দৃশ্যায়ন' হিসেবে একে চিহ্নিত করার এলিট 'দীক্ষায়ণ প্রকৌশল'-এর (সেলিম রেজা নিউটন; ২০০৩) মাধ্যমে দর্শকের মস্তিষ্ক আগে থেকেই প্রক্ষালিত করা আছে। আর তাই এলিট সমাজে আর্টফিল্মের যৌনদৃশ্য ব্যাপক বৈধতা উৎপাদন করে। সুতরাং এসব 'রগরগা' বলে আমরা চিহ্নিত করতেই ভয় পাই। আর এই প্রবণতাই ঋতুপর্ণদের আর সবার থেকে আলাদা, অন্যকিছু, প্রশ্নাতীত ভাবার ভ্রম তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়।

'চোখের বালি'র ক্যামেরার কাজ যদি আমরা লক্ষ করি, দেখব, ক্যামেরা অত্যন্ত ডিটেইলে ব্যবহৃত হয়েছে। আগেই বলেছি, এটা এ ধরনের ফিচারফিল্মের একটি প্রবণতা এই যে, ক্যামেরা স্থির থাকবে এবং একটি দৃশ্য, একটি চরিত্র ডিটেইলে চিত্রায়িত হবে। ফলে চলচ্চিত্রের দৃশ্যের বাঁকগুলো দর্শকের সামনে অধিক স্পষ্ট হয়। আর্টফিল্মের মধ্যবিত্তীয় টানাপোড়েনের টেক্সট (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই)-এর পাশাপাশি আমার মনে হয়, ক্যামেরার এই চিত্রায়ণ আমাদের চোখে যেমন আরাম দেয়, তেমনি পুরো চলচ্চিত্র উপভোগ্য করতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

চলচ্চিত্রটির ডায়ালগের যৌনতা নিয়েও আমি একটু আগে কথা বলেছি। এখানে আমি ব্যাখ্যায় যাব না। শুধু উদাহরণ হিসেবে চলচ্চিত্রে বিনোদিনী-আশালতার কথোপকথনের একাংশ তুলে ধরব। এখান থেকে ভাষাকেন্দ্রিক এই মেকি যৌনতা (সিউডো সেক্স)'র পাশাপাশি পাঠক একটু লক্ষ করবেন পুরুষতান্ত্রিক যৌন ভালগার, নারীর অধস্তনতার আনন্দ ও কম শক্তির প্রশ্ন, শিবের দোহাই এবং নারীর পারস্পরিক হিংসাটুকু—

মহেন্দ্র আশালতার জন্য একটি মখমলের 'মেমসাহেবী জামা' নিয়ে আসে, যা আশালতা একাই পরতে পারে না। সুতরাং বিনোদিনী জামা পরানো দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ সময়ে দুজনের কথোপকথন—

আশালতা : তুই পরিয়ে দিলেই হবে খালি, আমার শিখে নিতে হবে না? এই ধক্কড় জ্যাকেট পরেই ঘুমোবো নাকি রাত্তিরে?

বিনোদিনী : ঘুমোবার আগে তোমার বরই খুলে দেবে বালি। সে নিয়ে ভাবনা নেই।

---

[৭] যদিও এটা একটা সেক্সুয়ালি-বায়াসড প্রদর্শনীই বটে, কিন্তু ক্যামেরা সেখানে বাড়তি মাত্রা প্রদান করে। এই প্রদর্শনীর সামনা-সামনি বসলে এর আরো অনেক কিছুই লক্ষ করা যেতে পারত। যেমনটা করেছেন সুসান রাঙ্কল। তিনি 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা'য় নারীর স্ট্রাগলের জায়গাটাও আলাদা করে খেয়াল করেছেন (সুসান রাঙ্কল; ২০০৬)।

আশালতা : তুই খুব অসভ্য হয়েছিস বালি, হ্যাঁ-রে তুই আমার পুতুলের জন্য এরকম ছোট ছোট জামা করে দিবি? ওদের পরাতে পরাতে আমি শিখে যাব।

বিনোদিন : সোজা জিনিস, ভালো করে একবার দেখলেই শিখে যাবি। নে খোল, আমি দেখিয়ে দেই। (আশালতার জামা খুলতে খুলতে) একি করেছিস, কেটে ছুড়ে বুক দুটো একেবারে একসা করেছিস?

আশালতা : সে আর বলিস না ভাই, অত দস্যুপনা করলে আমি পারি? ওর গায়ের জোর আমার থেকে বেশি না বল?

বিনোদিনী : বারণ করতে গায়ের জোর লাগে না বালি। মনের জোর লাগে।

আশালতা : আমি অনেক বলেছিলাম, উনি বললেন ঠাকুর-দেবতারা নাকি এরকম করে। কালীদাসের বইতে আছে শিব নাকি পার্বতীকে...

বিনোদিনী : থাক, আমার বলার বলেছিলুম। একদিন কেটে, ছুড়ে, পেঁকে ঘা হয়ে যাবে, তখন তোমার ডাক্তার বরও কিছু করতে পারবে না। (বিনোদিনী চলে যেতে থাকে)

আশালতা : ও বালি, লক্ষ্মী ভাই আমার যাসনে, কী করতে হয় দেখিয়ে দিয়ে যা একবার।

বিনোদিনী : আর করবি না?

আশালতা : হুঁ, তোর দিব্যি।

বিনোদিনী : এই যে আজ তোদের বিয়ের একবছর পূর্ণ হবে, আজ রাতে উনি যদি জোর করেন...

আশালতা : জোর করলে বলব বালি বারণ করেছে।

বিনোদিনী : কী?

আশালতা : ও তা বলব না? তাহলে অন্য কথা বলব। কী বলব ভাই বলে দে না বালি?

বিনোদিনী : দোরটা দিয়ে দে। (আশালতা দোর দিয়ে দেয় ও বিনোদিনী জামা পরতে থাকে, আশালতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে)। তোর কর্তাকে বলবি বিয়ের রাতে বিয়ের সাজ কেউ ছাড়ে? এই জ্যাকেট আমি খুলব না। (পরা শেষ করতে করতে দর্শকের দিকে ঘুরে) দেখলি কেমন করে পরতে হয়?

বিনোদিনীর ওপর 'হাই কি লাইট'-এর খেলা চলে, আর ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বেজে ওঠে— 'মাধবও মিলনও তরে আমার রাধা, বাসরও সজ্জা করে বসি শুদ্ধ কুঞ্জমঞ্জিরে...'

এই যে কথোপকথন, তার পরে এই যৌনতা আরো প্রবলাকার ধারণ করে যখন দেখি, বিনোদিনীর বুকেও মহেন্দ্রর দেয়া সেই একই দাগ, যা সে আশালতার কাছ থেকে আড়াল করছে। আড়াল করছে দর্শকের কাছ থেকেও। ঋতুপর্ণ প্রমাণই করে ছাড়লেন, পুরুষমাত্রই আগ্রাসী, নারী তার খেলনা পুতুলমাত্র। যে এই আগ্রাসনের শিকার হতে পারে সে-ই আনন্দ পায়, আর যে পায় না সে হিংসা করে। এই হলো 'চোখের বালি'তে মোটের ওপর যৌনতার প্রদর্শনী এবং এই হলো আমার চোখে, 'চোখের বালি'র ঋতুপর্ণ।

এখন একটু আলাদা প্রসঙ্গে আসি, গেল দশকের পুরোটাই প্রায় গেল অশ্লীলতা থেকে ঢালিউডি ছবির উদ্ধারাভিযান। এফডিসির চলচ্চিত্র মানেই অধঃপতিত, বাতিল মাল। আর তাই এই অধঃপতিত চলচ্চিত্রের অধঃপাতকে রুখে বাংলা চলচ্চিত্রকে মহিমান্বিত করতে সিনা টান করে ঘুরে দাঁড়ায় ১৬ মিলিমিটার ফরম্যাটে নির্মিত 'বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র'। অতি অবশ্যই চলচ্চিত্রের এই ধারা বাংলা চলচ্চিত্রকে অনন্য মোড় দিয়েছে। নির্মাণ করেছে আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলা চলচ্চিত্রের আলাদা পরিচয়। কিন্তু অ্যাকাডেমিকভাবে দেশ-বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'বিকল্প' চলচ্চিত্রের নির্মাতাগণ এবং সুশীল সমাজের মহারথীগণ এফডিসির অ্যাকাডেমিকভাবে অশিক্ষিত শ্রেণির বানানো এই চলচ্চিত্রগুলোকে এক কথায় নাকচ করে দিলেন। আর অন্যদিকে তাঁদের বানানো বিকল্প চলচ্চিত্রগুলো হয়ে উঠল শিল্পিত রুচির এলিট সাংস্কৃতিক উপাদান, যার মর্মার্থ সবার বোঝার সাধ্যের বাইরে। বোদ্ধামহলের চিন্তা-চেতনার পরিসরেই শুধু চলচ্চিত্রগুলোর আনাগোনা, আলোচনা, সমালোচনা চলতে থাকল।

আর এই চলচ্চিত্রগুলোর পাশাপাশি নির্মিত হতে থাকল বিভিন্ন ব্রান্ডের অর্থায়নে করপোরেট আধুনিকতার মোড়কে মোড়ানো সব চলচ্চিত্র। যে চলচ্চিত্রগুলোতে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের উঠতি জেনারেশন দীক্ষা পেতে থাকল লিভ টুগেদার, লিটনের ফ্ল্যাট, ইউরো লেমন, ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স, ট্রান্সকম ফুড, বসুন্ধরা, রেডিও ফুর্তি, বিশ্বায়নের যুগোপযোগী পলিশড কারাগার (শরমিন ও নিউটন, ২০১১), টেলিকম, প্রক্সি গার্ল-প্রক্সি বয়, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। এই চলচ্চিত্রগুলো মুক্তি পেতে থাকল স্টার সিনেপ্লেক্স ধরনের এলিট সিনেমা হলগুলোতে। আবার এগুলোর মধ্যেই কিছু চলচ্চিত্র 'টেলিছবি' নাম নিয়ে উপস্থিত হতে লাগল। যেই চলচ্চিত্রগুলো টেলিভিশনে মুক্তি পাবার পর গুটিকতক সিনেমা হলে প্রদর্শনের জন্য কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই চলচ্চিত্রগুলোর সাথে সাধারণ জনগণের মোটের ওপর কোনো লেনদেনই থাকে না।

এখানে একটু বলে রাখা প্রয়োজন, বাম ও বামঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি কখনো করপোরেট কখনো রাজনৈতিক মদদপুষ্ট আরেকটি এলিট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল (বর্তমানে প্রথিতযশা মঞ্চনাটকওয়ালারা, বিকল্প সিনেমা বানানেওয়ালারা] করপোরেট সংস্কৃতির অতি অর্বাচীন চলচ্চিত্র ও নাটকের যাঁরা মুখপাত্র (মুস্তফা সরয়ার ফারুকীরা) তাঁদের ক্রমাগত প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকলেন, সংস্কৃতি গেল গেল রবও তুললেন। এর কারণ আমার মনে হয়েছে, বাজারি আধুনিকতা এই চলচ্চিত্রগুলোতে একেবারেই প্রবল; সেক্স এখানে অত্যন্ত লঘুচালে উপস্থাপিত। তাই করপোরেট মুনাফাকেন্দ্রিক '১৬ আনা বাঙালি' সংস্কৃতিমনা লোকজন বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেন্দ্রিক রাজনীতি করেন বলে সমাজে স্বীকৃতিপ্রাপ্তরা সেক্স ও সম্পর্কের এই লঘু উপস্থাপনকে প্রায় একেবারেই খারিজ করে দিতে রাজি ছিলেন।[৮] কিন্তু এই চলচ্চিত্রগুলোর রয়েছে শক্ত করপোরেট ভিত্তি। রয়েছে প্রথম আলোর মতো সুশীল-করপোরেট মহামিডিয়ার মহাপক্ষপাত। ফলে প্রবল প্রতাপে চলচ্চিত্রের এই লঘুধারাও ঠিক টিকে গেল বাংলাদেশে। যেজন্য এই কথাগুলো বলছি, তা হলো, শক্তিধর করপোরেট মুনাফার কঠিন ভিত্তিতে দাঁড়ানো ফারুকীদের চলচ্চিত্রে যৌনতা প্রদর্শনের বিপরীতেও একটি এলিট সাংস্কৃতিক স্রোত দাঁড়িয়ে গেল বাংলাদেশে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঋতুপর্ণদের মতো ফিল্মওয়ালাদের চলচ্চিত্রে পুরুষাধিপত্যকেন্দ্রিক যৌনতার অতি চিত্রায়ণ নিয়ে না 'এপার বাংলা' না 'ওপার বাংলা' কোথাও আলাদা করে কোনো আওয়াজ শোনা গেল না। আসলে আর্ট, নান্দনিকতা, সৌন্দর্যবোধ-

---

[৮] মজার ব্যাপার হলো এই যে, এই যুগে এসে এই চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ করার পাটাতন যে তারাই ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন, তা তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন নি।

সম্পর্কিত আমাদের এলিট দীক্ষা, এই ধরনের চলচ্চিত্র নিয়ে বিপরীত স্রোতে কথা বলার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আবার সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের 'গাইয়া', 'ক্ষেত', 'অশিক্ষিত', 'আনকালচারড', 'মামা'শ্রেণির প্রধান বিনোদন ঢাকাই চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত যৌনতা শহুরে, শিক্ষিত, কালচারড, স্যার, নান্দনিক রুচিওয়ালা শ্রেণির কাছে কুরুচিপূর্ণ মনে হতে থাকে।

সুতরাং এফডিসির চলচ্চিত্রের বিপরীতে মধ্যবিত্তীয় রুচির এলিট প্রচারণায় এই চলচ্চিত্রগুলো অশ্লীলতার দায় নিয়ে একেবারেই প্রান্তে চলে গেল। সুশীল-সমাজপতিদের মতে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা মানে হলো, যা বাবা-মা-সন্তানদের নিয়ে একসাথে দেখা যায় না, যেসব চলচ্চিত্র 'অসামাজিক', 'ভালগার' ও 'কুৎসিত যৌনতায়' পরিপূর্ণ। এই কুৎসিত যৌনতা ব্যাপারটি হলো নাচের মধ্যে অযথাই নারীর বুক-পাছা নাচানো (যে নারীশরীরের মাপ প্রচলিত বাজার অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড নয়, বরং স্থূল), বিভিন্ন ধরনের রগরগে ডায়ালগ বা গান, যেমন, 'ভরা যৌবন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে আমার সতীত্ব শেষ হয়ে যাবে। আমাকে নষ্ট করে দেবে।' (ইস্পাহানী আরিফ জাহান; ২০০৫) বা 'মারব রে প্রেমের গুল্লি চোখেরই পিস্তলে' (ইস্পাহানী আরিফ জাহান; ২০০৫) বা 'তোমার মিষ্টি জওয়ানী দাও আমায় সজনী... আমার মিষ্টি জওয়ানী সবই তোমার এখনই... তুমি কর আমাকে... মন দিলাম তোমাকে' (ইস্পাহানী আরিফ জাহান; ২০০৫), বা 'ইন্সপেক্টর ফোন পাইয়া বউয়ের নরম কোল ছাইড়া গরম জায়গায় আইয়া পড়সে' (পি এ কাজল, ২০০৮/২০০৯), বা 'তুমি কই, তুমি কই তোমার বুকের মধ্যেখানে' (কাজী হায়াৎ, ২০০০) ইত্যাদি, বা নারীকে অর্ধনগ্ন কস্টিউম পরানো, স্থূল শারীরিক ভঙ্গিমা, সর্বোপরি কাটপিস সংযোগ করা। তো এই রুচিশীল সমাজপতিদেরই প্রশ্ন করি : ঋতুপর্ণের 'চোখের বালি' কি বাবা-মা-সন্তানদের নিয়েই একসাথে বসে দেখেছেন, নাকি আলাদা আলাদা? পুরো 'চোখের বালি'র যৌনতা নিয়ে তো বিশাল পরিসরে আলোচনা করলাম। এর যৌনতা প্রদর্শনের সাথে ঢাকাই চলচ্চিত্রের পার্থক্যটা কোথায় তা বলবেন কি দয়া করে? আমি বলছি পার্থক্যটা কোথায়। কেবল রুচিতে। 'চোখের বালি'তে স্ট্যান্ডার্ড নারীশরীর (ঐশ্বর্য, রাইমা) সুশীল চোখে যৌনতার জোগান দেয়, আর ঢাকাই চলচ্চিত্রের মোটা শরীর (শাবনূর, পপি, ময়ূরী) খেটে খাওয়া শ্রমজীবী চোখে সেক্স জাগায়। নারী কিন্তু তার অবস্থানে স্থির। সে নিষ্ক্রিয় কামবস্তু শুধু। তা সে ঋতুপর্ণই দেখান আর ইস্পাহানী আরিফ জাহান কি পি এ কাজলই দেখান।

আদতে বাজারের এই যুগে রুচিশীলতা, সংস্কৃতি, নান্দনিকতার মোড়কে সবই গেলানো সম্ভব। আর এই গেলানো জায়েজ করা হয় বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে। আর তাই এই যুগে এদেশে আসেন শাহরুখ খান, রানী মুখার্জী, মুন্নি বদনাম (মালাইকা), উলালা (বাপ্পী লাহিড়ী)। অর্ধনগ্ন চলতি বাজারের আদর্শ শারীরিক গড়নের নারীদের সাথে নিয়ে নৃত্যরত শাহরুখ, মালাইকা 'ধামাকা' লাগিয়ে দেন বাংলাদেশে। তাঁর এই নৃত্য আপারক্লাস তরুণ-কিশোর নারী-পুরুষের মন জয় করে ফেলে। এই অনুষ্ঠান কিন্তু শালীনতা-অশালীনতার মাপকাঠিতে মাপার বোকামিতে সুশীল সমাজ যায় না। এর সাথে আন্তর্জাতিক বাজার জড়িত যে! 'লাক্স চ্যানেল আই সুপার স্টার' প্রতিযোগিতা চলে বহাল তবিয়তে। নারীর শরীর প্রদর্শনীর 'বৈধ' মঞ্চে নারীর ক্ষমতায়নের ফাঁকা বুলির বলয়ে বাজার প্রসারণের খেলা চলে। সুশীল সমাজ, রথী-মহারথীরা নিশ্চুপ। ওই যে বাজারের চাপ, করপোরেট জমানার চাপ।

আর সমাজ যেহেতু আমরা ('শিক্ষিত' মধ্যবিত্তওয়ালারা, উচ্চবিত্ত ও ব্যবসায়িক শ্রেণি) চালাই, যেহেতু মিডিয়া আমাদের, আইন আমাদের, পুলিশ আমাদের, রাষ্ট্র আমাদের, ক্ষমতা আমাদের, সুতরাং রুচিটাও শুধুই আমাদের। সেহেতু যা কিছু আমাদের রুচির সাথে মিলবে না, তাকেই খারাপ,

বাজে, নষ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবণতা আমাদের ষোলোআনা। যেহেতু বাংলা ঢাকাই চলচ্চিত্রের রুচি আমাদের সাথে মেলে না, তাই এটা অশ্লীলতা কিন্তু ঋতুপর্ণের ধ্রুপদী আঙ্গিকের যৌনতার প্রদর্শনী আমাদের রুচির সাথে মেলে, তাই এটা আর্ট। আসলে মজার ব্যাপার হলো, কী 'আর্ট' হবে, পুরস্কার পাবে, নন্দিত হবে আর কী তিরস্কার পাবে, নিন্দিত হবে তা এলিট শ্রেণির গুটিকতক মানুষ কর্তৃক নির্ধারিত। অন্য শ্রেণির বিশাল অঙ্কের মানুষের পছন্দ-অপছন্দকে বিবেচনায় আনার কথা এরা ভেবে দেখেন না। ভেবে দেখেন না মান্না মারা গেলে সারা দেশে মাতম উঠে যায়। লক্ষ করেন না ঢাকার রাস্তার ট্রাফিকজ্যাম সেদিনের জন্য আরো প্রবল হয়ে ওঠে। কারা ভালোবাসে মান্নাকে এত প্রবলভাবে? আপনি আমি তো নই! তবে কারা? কেনই বা ভালোবাসে বিভিন্ন 'অশ্লীল' সিনেমায় অভিনয় করা এই নায়ককে? এটা ভেবে দেখাটা কিন্তু সত্যি অত্যন্ত জরুরি।

৪. অবশেষে আরো একটু বলে নিতে চাই

এই লেখাটিতে আলাদা করে ঋতুপর্ণ ঘোষকে আক্রমণ করেছি বলে যদি কেউ ভেবে বসেন তবে বিনয়ের সাথে বলতে চাই, আপনি ভুল ভেবেছেন। আরো একটু খোলাসা করে বলি, এ হলো মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, যাবতীয় কিছু বেচাটাই এই যুগের নিয়তি। আর সবকিছুর মধ্যে প্রবল রমরমা হলো সেক্সের বাজার। যুগের হাওয়া গায়ে লাগবে না তা কি হয়? তাই ঋতুপর্ণও এই হাওয়া এড়াতে পারেন না। উনিও তাই সেক্সই বেচেন। তবে ওই যে নিজেকে যুগ অতিক্রমকারী, প্রথাবিরোধী, নারীবাদী এসব বলে অনেকের থেকে আলাদা, অনন্যসাধারণ কিছু হয়ে ওঠার প্রবণতা; সেলিম রেজা নিউটন তাকে বলেন 'পুঁজির যুগের প্রবণতা' (নিউটন, ২০০১)। এ প্রবণতা যেমন হুমায়ুন আজাদে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে (নিউটন, ২০০১) ঠিক তেমনি ঋতুপর্ণ ঘোষদেরও পিছু ছাড়ে না। যুগ অতিক্রম করার স্বপ্নে বিভোর ঋতুপর্ণরা তাই যুগের, পুঁজির সেক্সকেই বারবার উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করে চলেন স্ট্যান্ডার্ড মাপের শরীরে, বিছানায় পুরুষকে কর্তা বানিয়ে, নারীকে গহনাসর্বস্ব বানিয়ে, নারীর বুক দেখিয়ে, নারীকে নিপীড়নের আনন্দে উদ্বেল বানিয়ে, হিংসায় এবং পরকীয়ায়। আমি এই লেখাজুড়ে এটাই শুধু দেখাতে চেয়েছি। আলাদা করে তার ওপর আমার কোনো আক্রোশ নেই, এটা পাঠক অবশ্যই বুঝবেন আশা করি।

তবে ঋতুপর্ণ আলাদা অন্য জায়গায়। যুগের এই হাওয়াকে আঁকড়ে ধরে এই যুগটাকেই প্রবলভাবে তুলে ধরেন সবার সামনে। তাই তো তাঁর চলচ্চিত্রে যৌন অনুভূতি উসকে দেবার লুকোচুরির বাড়াবাড়ি থাকলেও গালিগালাজ বা সেক্সুয়াল ডায়ালগে অন্য অনেক চলচ্চিত্রের মতো 'বিপ' চেপে দেবার 'ভদ্রতার লুকোচুরি' ঋতুপর্ণ দেখান না। এই সময়ের আরো অনেকের থেকে এগিয়ে সবার সামনে উগরে দেন সকলের অন্তরে আগলে রাখা 'নিষিদ্ধ' যৌনতাকে। আড়ালে-আবডালে রাখঢাক গুড়গুড় করা সেই যৌনতা স্পষ্ট করে দেন সবার সামনে। এই চলচ্চিত্রের দর্শক কিন্তু মহেন্দ্রদের মতো ভদ্রমানুষেরাই। এই ভদ্রশ্রেণির পুরুষতান্ত্রিক যৌনতার আড়ালকে তিনি একপ্রকার উন্মোচনই করে দেন। তাঁরা নিজেকে খুঁজে পান মহেন্দ্রর কামুকতায়, বিহারীর সতীত্বে, আশালতার অধীনতায় আর বিনোদিনীর মেকি জেল্লায়। শুধু ভদ্রশ্রেণির জন্য চলচ্চিত্র বানিয়ে হিট ছবি পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এজন্য প্রচণ্ড পরিশ্রমের প্রয়োজন, প্রয়োজন চিন্তাশীল পাটাতনের। আর এই চিন্তাশীলতা থেকেই তিনি জানেন, এলিট পুরুষাধিপত্যিক চিন্তাচেতনার সুড়সুড়িটা কোথায়। মোক্ষমভাবে সুড়সুড়িটা জায়গামতোই দেন তিনি। কারণ ঋতুপর্ণ তো এই এলিট শ্রেণিরই মহারথী। হতে পারেন তিনি 'নারীসুলভ পুরুষ' (সৌভিক মিত্রা, ২০০৯)। কিন্তু বিশ্বায়িত অর্থনীতির এই যুগে সম্পদ

(বুদ্ধিবৃত্তিক বা আর্থিক), অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি, সামাজিক সম্মান নির্ধারণ করবে কে আসল ‘পুরুষ’। সেই সার্বিক অর্থে ঋতুপর্ণ আর দশজন ভদ্রলোক ও অল্প কিছু ভদ্রনারীর মতো প্রবল এক পুরুষই বটে, যার প্রমাণ তিনি রেখে দিয়েছেন তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র ‘চোখের বালি’তে।

মনিরা শরমিন প্রীতু জুনিয়র এডিটর, ইংলিশ ডেস্ক, এটিএন বাংলা। pritu.ru@gmail.com

তথ্যনির্দেশ

বইপত্র

আ-আল মামুন (২০০৭), “বাংলা সিনেমা উদ্ধার প্রকল্প : চন্দ্রকথা, ব্যাচেলরদের পোয়াবারো’, যোগাযোগ, সংখ্যা ৮, ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন সম্পাদিত, বিকল্প অফসেট প্রেস, রাজশাহী।

ফাহমিদুল হক (২০১১) অসম্মতি উৎপাদন : গণমাধ্যম-বিষয়ক প্রতিভাবনা, পৃষ্ঠা ৪৯-৫৪, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা।

ফাহিমা দুররাত (২০০৬) “ঋতুপর্ণের চোখের বালি”, ফ্ল্যাশব্যাক, বর্ষ ১০, সংখ্যা ১, মোকাররম হোসেন শুভ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৩৮-৪১, ডিইউএফএস পাবলিকেশন, টিএসসি, ঢাকা।

মনিরা শরমিন ও সেলিম রেজা নিউটন (২০১১) রুপালী পর্দার কারাগার : বাংলা চলচ্চিত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে সেলিম রেজা নিউটনের তত্ত্বাবধানে মনিরা শরমিন কর্তৃক সম্পাদিত মাস্টার্স-অভিসন্দর্ভের ভিত্তিতে বিরচিত (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) পুস্তক-পাণ্ডুলিপি। অপ্রকাশিত। যন্ত্রস্থ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৯) চোখের বালি, বাংলাবাজার, ঢাকা।

লরা মালভি (২০০৭) “চোখের আরাম ও বর্ণনাধর্মী চলচ্চিত্র”, ফাহমিদুল হক কর্তৃক অনূদিত, যোগাযোগ, সংখ্যা ৮, ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন সম্পাদিত, বিকল্প অফসেট প্রেস, রাজশাহী।

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৩) “বাজারের যুগে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আব্বু-আব্বু-সমাচার অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান মহাজনী মুদ্রণের পলিটিক্যাল ইকোনমি”, কামরুল হাসান মঞ্জু কর্তৃক সম্পাদিত জনপরিসরে গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ গ্রন্থে মুদ্রিত, ঢাকা : ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার।

সেলিম রেজা নিউটন (২০০১) “হুমায়ুন আজাদের ‘কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ’ : পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষয় ও ক্ষরণ সম্পর্কে একটি আলোচনা”, সপ্তক (আলী আরিফুর রেহমান কর্তৃক সম্পাদিত), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রাজশাহী : ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৬) ‘প্রথম আলো’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সুসান রাঙ্কল (২০০৪), “সৌন্দর্য উৎপাদন”, সেলিম রেজা নিউটন কর্তৃক অনূদিত (২০০৬), চন্দ্রাবতী (সুস্মিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত), রাজশাহী।

http://www.washingtonbanglaradio.com/content/11777811-program-antahin-adda-dated-24-th-decemberwe-could-see-inner-side-rituparno-ghosh.

চলচ্চিত্র

কাজী হায়াৎ (২০০০), ইতিহাস

মুস্তফা সরয়ার ফারুকী (২০০৩), ব্যাচেলর

ইস্পাহানী আরিফ জাহান (২০০৫), সন্ত্রাসী মুন্না

ঋতুপর্ণ ঘোষ (২০০৫), অন্তরমহল

পি এ কাজল (২০০৭), ক্ষমতার গরম
ফারাহ খান (২০১০), তিস মার খান
শ্রীজিৎ মুখোপাধ্যায় (২০১১), ২২শে শ্রাবণ
অঞ্জন দত্ত (২০১১), রঞ্জনা আমি আর আসব না
মৈণাক ভৌমিক (২০১২), বেডরুম

টেলিভিশন অনুষ্ঠান

সৌভিক মিত্রা (২০০৯), ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি, ব্লু ওয়াটার পিকচার্স, স্টার জলসা
http://www.banglatorrents.com/showthread.php?13785-mir-er-songe-ghosh-and-company
www.starjalsha.com/shows/ghosh_and_company.A

ঋতুপর্ণের নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম ও সাল

চিত্রাঙ্গদা (২০১২) : পরিচালক
সানগ্লাস (২০১২) : পরিচালক
নৌকাডুবি (২০১১) : পরিচালক
মুম্বই কাটিং (২০১১) : পরিচালক
দ্যা লাস্ট লেয়ার (২০০৮) : লেখক, পরিচালক
অন্তরমহল (২০০৫) : পরিচালক
দোসর (২০০৫) : পরিচালক
রেইনকোট (২০০৪) : লেখক, পরিচালক
চোখের বালি (২০০৩) : লেখক, পরিচালক
শুভ মহরত (২০০৩) : লেখক, পরিচালক
তিত্‌লী (২০০২) : পরিচালক
উৎসব (২০০০) : লেখক, পরিচালক
অসুখ (১৯৯৯) : পরিচালক
বাড়ীওয়ালি (১৯৯৯) : লেখক, পরিচালক
দহন (১৯৯৭) : লেখক, পরিচালক
উনিশে এপ্রিল (১৯৯৪) : লেখক, পরিচালক
হিরের আংটি (১৯৯২) : লেখক, পরিচালক

http://www.chakpak.com/celebrity/rituparno-ghosh/movies/14252

বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ঋতুপর্ণের পুরস্কার ও মনোনয়নপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র

পুরস্কারপ্রাপ্ত

বোম্বে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

১৯৯৯ : এফআইপিআরইএসসিআই (FIPRESCI) পুরস্কার (বিশেষ মন্তব্য) (Special Mention) - ‘অসুখ’

২০০২ : এফআইপিআরইএসসিআই (FIPRESCI) পুরস্কার (জুরি পুরস্কার) - ‘তিত্‌লী’

বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

২০০০ : এনইটিপিএসি (NETPAC) পুরস্কার - ‘বাড়ীওয়ালি’

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

১৯৯৫ : সেরা ফিচারফিল্ম - ‘উনিশে এপ্রিল’

১৯৯৮ : সেরা স্ক্রিনপ্লে - ‘দহন’

২০০১ : সেরা নির্মাতা - ‘উৎসব’

২০০৩ : সেরা বাংলা ফিচারফিল্ম - ‘শুভ মহরত’

২০০৪ : সেরা বাংলা ফিচারফিল্ম - ‘চোখের বালি’

২০০৫ : সেরা হিন্দি ফিচারফিল্ম - ‘রেইনকোট’

২০০৮ : সেরা ইংরেজি ফিচারফিল্ম - ‘দ্যা লাস্ট লেয়ার’

২০০৯ : সেরা বাংলা ফিচারফিল্ম - ‘সব চরিত্র কাল্পনিক’

২০১০ : সেরা নির্মাতা - ‘আবহমান’

২০১০ : সেরা বাংলা ফিচারফিল্ম - ‘আবহমান’

মনোনয়নপ্রাপ্ত

কার্লভি ভ্যারি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

১৯৯৮ : ক্রিস্টাল গ্লোব (সেরা চলচ্চিত্র) - ‘রেইন কোট’

লোকার্নো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

২০০৩ : গোল্ডেন লেপার্ড (সেরা চলচ্চিত্র) - ‘চোখের বালি’

২০০৫ : গোল্ডেন লেপার্ড (সেরা চলচ্চিত্র) - ‘অন্তরমহল’

http://en.wikipedia.org/wiki/Rituparno_Ghosh#Awards